১। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গ অবলম্বনে রক্ষোরাজ রাবণের চরিত্রের বিশদ আলোচনা করো।

উত্তরঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রকৃত নায়ক রাবণ,মেঘনাদ নন,এই কাব্যে রাবণ-চরিত্র এবং নিয়তি-বাধিত রাবণের দুর্ভাগ্যকেই প্রধান করে চিত্রিত করা হয়েছে।'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় রাবণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা কবি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেনঃ ' The idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow'।সমগ্র কাব্যে রাবণের পৌরুষ এবং শৌর্যবীর্যের জয় ঘোষিত হয়েছে।অথচ এত মহিমা থাকা স্তত্ত্বেও তার পরাজয় ঘটে ।কেন না,শক্তিতে ঐশ্বর্যে ক্ষমতায় সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তিনি বিরাট পুরুষ হলেও তাঁর জীবন দৈবাহত। তার দুরদৃষ্টের ফলস্বরূপ মহাবীর কুম্ভকর্ণ প্রাণ হারান,বীরবাহু সমরে নিহত হন,নিজের হাতে গড়া লঙ্কাপুরীর দীপাবলী একে একে নিভে আসে।নিদারুণ পুত্রশোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। রাজসভায় পাত্রমিত্র সভাসদের মধ্যে অবস্থান করেন নিয়তির প্রতিকূলতায়-'এ হেন সভায় বসে রক্ষকূলপতি, বাক্যহীন পুত্রশোকে'।

কোন এক সমালোচকের ভাষায়, 'একদিকে আত্মস্মৃতির দুর্জয় কামনা,অন্যদিকে আত্মক্ষয়কারী স্নেহপ্রীতির পারবশ্য,মানুষের প্রকৃতিগত এই দ্বন্দ্ব ও দুরবস্থা'- রাবণ চরিত্রকে উজ্জ্বল অথচ ট্র্যাজিক করে তুলেছে।

রাবণ প্রতাপশালী সম্রাট।তার হৃদয় ভয়শূন্য,তিনি স্নেহশীল পিতা,বিরাট যোদ্ধা ,ভ্রাতাভগ্নী-স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ববোধ প্রবল।বিভীষণকে বাদ দিলে লঙ্কাপুরীতে কে তার শত্রু আছে? অমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ,ভয়শূন্য হলেও মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে তার আত্মবিশ্বাসের গোঁড়ায় চিড় ধরে।তার সংশয় উপস্থিত হয়।বুঝি ভাগ্যদেবতা বিমুখ, 'বিধি বাম'-নইলে এমন অভাবিত ঘটনা ঘটবে কেন। রাবণ ধীরে ধীরে নিয়তিবাদী হয়ে পড়েন। তার সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একটা বৈফল্যের সুর তাকে হতোদ্যম করে ফেলে। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেন,

হায় বিধি বাম মম প্রতি।

কে কবে শুনেছে,পুত্র, ভাসে শিলা জলে,

কে কবে শুনেছে,লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?

রাবণ-চরিত্রের এই নৈতিক টলায়মান অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।সমালোচকের ভাষায়, ‘রাবণের পরাজয় বাহিরে নয়,ভিতরে। তাহার বল-বীর্য ঐশ্বর্যের পরিণাম শোকাবহ হোক,তাহা অপেক্ষা ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার হৃদয়-রাজ্যে’ ।

‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর প্রথম সর্গে অমিতপরাক্রম সর্বরগুণান্বিত রাবণের দৈবাহত করুণ-বিষাদ মূর্তিখানি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সর্গের প্রথমে ভগ্নদূত মকরাক্ষ এসে রাবণকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে রামচন্দ্র-কতৃক বীরবাহু বধের সংবাদ জানাল। এ সংবাদে প্রথম রাবণ বিস্মিত। বীরবাহুর মৃত্যু এতটা অভাবিত যে, কিছুক্ষণের জন্য রাবণ রুদ্ধবাক। তারপর শুরু হল তার শোকোচ্ছ্বাস। এই শোক-প্রকাশের কারণ দু’টি। প্রথমত,পিতা হিসেবে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ জনিত অভিভূতি। দ্বিতীয়ত,নিয়তির প্রতিকূলতা হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে চিত্তচাঞ্চল্য । মন্ত্রী সারণ যখন তাকে রাজসভায় শোক প্রকাশ করা রাজোচিত নয়-একথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখনও রাবণ স্থিরচিত্ত হতে পারেন না। কেন না, এই শোক এত গভীর, এত গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক যে, স্থানকালপাত্রের সচেতনতা তখন আর থাকে না। শেষ পর্যন্ত রাবণ শোক সংবরণ করলেন। পুরীর বহির্দেশে সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিহত পুত্র বীরবাহুকে দেখবার বাসনায় পাত্রমিত্রসহ লঙ্কার উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করেন। পুত্রকে দেখে রাবণের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠে। বীরবাহু দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে।সুতরাং এই মৃত্যুতে দেশের জন্য আত্মদানের যে মহত্ত আছে তা রাবণকে গর্বিত করে তোলে। কিন্তু, রাবণ বীর হলেও রক্তমাংসের মর্তবাসী। সুতরাং, সেই বীরত্ববোধ নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক তাকে অভিভূত করে ফেলল। রাজা রাবণের বীরত্ব এ ক্ষেত্রে যেমন প্রশংসনীয়,ঠিক তেমনি পিতা রাবণের শোকও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে ।

রাবণ অমিতশক্তির অধিকারী । কিন্তু সে শক্তিরও একটা সীমা আছে। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু তাই তার পক্ষে শোক প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই। এখানে রাবণ রক্ত মাংসে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। তার শক্তির সীমাবদ্ধতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে,তিনি যত বড় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেন,নিয়তির নিয়মকে লঙ্ঘন করা তা পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে অদৃষ্ট এতটা প্রাধান্য লাভ করেছে যে,তার শক্তির দম্ভ ম্লান হয়ে গেছে।

পুত্র শোকাতুর চিত্রাঙ্গদার সভাগৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকট হয়ে উঠেছে। চিত্রাঙ্গদা যেন রাবণের অন্তঃস্থিত সুপ্ত বিবেক । রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে নিষ্ফল সান্ত্বনা দিতে উদ্যত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদাকে বীর মাতা বলে তার শোক নিবারণ করতে বলেছেন। পুত্র বীরবাহু দেশের জন্য প্রাণ দান করেছে। সুতরাং তার মৃত্যুর মধ্যে মহত্বের যে ব্যঞ্জনা রয়েছে তার কথা উল্লেখ করে রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু, এসব যুক্তি চিত্রাঙ্গদার কাছে নেহাতই মামুলি বলে মনে হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা উত্তরে বলেছেন, দেশের জন্য বীরবাহুর যদি মৃত্যু হত তবে অনুশোচনার কিছু থাকত না। কিন্তু, তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য রাবণই দায়ী। কেন না, রাবণ পাপাচারী। রাবণ রামচন্দ্রের স্ত্রীকে হরণ করেছেন।সেই পরস্ত্রী হরণের প্রতিফল-স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃত্যু হয়েছে।সুতরাং, বীরবাহুর মৃত্যুর পেছনে কোন মহত্বের আরোপ চলে না।বস্তুত রাবণ লঙ্কার সর্বনাশ ডেকে আনছেন। কেন না ,মুখে রাবণ যতই আস্ফালন করুন না কেন,- রাবণের ক্রিয়াকলাপ যে পাপের দ্বারা কলঙ্কিত,সীতা হরণজনিত পাপকর্ম যে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না,এবং সেই পাপের ফলেই যে চতুর্দিক থেকে লঙ্কাপুরীর বিপদ ঘনায়মান হচ্ছে,তা রাবণ কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের অবতারনা করে মধুসূদন রাবণের অন্তঃস্থিত নৈতিক দুর্বলতাকে দেখিয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা রাজসভা ত্যাগ করলে রাবণ মনস্থ করলেন তিনি স্বয়ং সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। রাবণ সর্বদিক থেকে বিপর্যস্ত হলেও বীরধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। পুত্রের মৃত্যু এবং চিত্রাঙ্গদার মর্মান্তিক সত্যবাণী রাবণকে বিমূঢ় করলেও অলস করেনি। রাবণ দুর্জয় পৌরুষের অধিকারী। এজন্য তিনি পুত্র হত্যার প্রতিশোধে তৎপর হন,পুত্র বিয়োগ জনিত শোকে মুহ্যমান হয়ে অকর্মণ্য

হয়ে পড়েন না।যতই তার শোক বর্ধিত হয় ততই তিনি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠেন। এখানেই রাবণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

রাবণ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত,এমন সময় প্রমোদোদ্যান থেকে মেঘনাদ এলেন সভাগৃহে। তিনি পিতার নিকট প্রার্থনা করেন আসন্ন সংগ্রামের সৈন্যাপত্য।শঙ্কিত রাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। মেঘনাদ কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ। পুত্র ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার আগ্রহাতিশয্য দেখে শেষ পর্যন্ত রাবণ তাকে আসন্ন যুদ্ধে সেনাপতি পদে বরণ করলেন।এখানে আবার রাবণের সংশয় ও নৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।যুদ্ধযাত্রার প্রক্কালে তিনি ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করে ইষ্টদেবতা অগ্নিকে পূজা করে বর গ্রহণের উপদেশ দেন। মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। ইনি পূর্বে দুইবার সম্মুখ সমরে রামচন্দ্র মেঘনাদের কাছে পরাস্ত হয়েছেন।তাকে যুদ্ধের পূর্বে দৈবানুগ্রহলাভের উপদেশ দানের মধ্যে রাবণের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। ঘটনাচক্রের গতি যেভাবে ঘুরেছে,তাতে রাবণ আর আত্মশক্তির উপর ততটা নির্ভরশীল হতে পারছেন না । তিনি দৈববলে কামনা করছেন। এই সর্গে অমিততেজা রাক্ষস শ্রেষ্ঠ রাবণের দুর্বলচিত্ততা এবং দৈবশক্তির প্রতি নির্ভর সবিশেষ লক্ষনীয় বিষয়।

‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর রাবণ চরিত্র একান্তভাবেই মধুসূদনের সৃষ্ট চরিত্র। বাল্মিকী ও কৃত্তিবাসের রাবণ চরিত্র দুরাচার,কুক্রিয়াসক্ত, পাপকার্যের প্রতিভূ। সেখানে রাবণের শৌর্যবীর্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও কখনো রাবণ কবির সুহৃদয় আনুকূল্য লাভ করেননি। কিন্তু, এ কাব্যে রাবণ দুরাচার রাক্ষস মাত্র নন।তার চরিত্রে নানা গুনের সমাবেশ ঘটেছে।ইষ্টে তার নিষ্ঠা আছে,দেবতায় তার ভক্তি আছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার পেছনে ব্যাক্তিগত দোষত্রুটির চেয়ে তার সমাজবোধ বড় হয়ে উঠেছে। তার স্নেহশীলতা এবং কর্তব্যবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। মহাবীর ভাগ্য নির্যাতিত রাবণের প্রতি পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় ভরে যায়।

রাবণ-চরিত্রের সঙ্গে ব্যাক্তি কবি মধুসূদনের নানা দিক থেকে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাক্তিগত জীবনে ভাগ্যের বিড়ম্বনা মধুসূদঙ্কে একদা উৎকেন্দ্রিক করে তুলেছিল। তাছাড়া আত্মকৃত ভ্রান্তির বশে তিনি জীবনের কত অমূল্য সময়ই নষ্ট করেছিলেন। রাবণের শোক-বিলাপ যেন যেন মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-এরই প্রতিধ্বনি । ফলত, রাবণ-চরিত্র নীতিগত দিক থেকে গ্রহণীয় না হলেও তার মহিমা,তার ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

M.P

****